গ্রন্থবীক্ষণ

জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের শতবর্ষ

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদনা স্বামী চেতনানন্দ, *দেবীতীর্থ জয়রামবাটি : মাতৃমন্দিরের শতবর্ষ জয়ন্তী* (১৯২৩-২০২৩)। শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটি, ২০২৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২০, ৪০০ টাকা।

কোনও এক ধর্মীয় মহাপ্রাণের শরীরত্যাগের প্রায় অব্যবহিত পর ভক্তদের দ্বারা তাঁর স্মৃতিসৌধ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা; এবং তারপর সেই তাৎক্ষণিক আবেগ ক্রমশ স্তিমিত হওয়ার পরিবর্তে সময়ের স্রোতে ডালপালা মেলতে মেলতে প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পেরিয়ে সজীব, সতেজ মহীরুহ হিসেবে আরও বিস্তৃত হয়ে চলা—পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বেশি নেই। জয়রামবাটির মাতৃমন্দির সেই বিরল গোত্রের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

শ্রীমা সারদা দেবীর মহাপ্রয়াণ ২১ জুলাই ১৯২০। সেই বছরই মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে জয়রামবাটিতে কয়েকটি নতুন কুটির তৈরি করা হয়। (পৃষ্ঠা ২৭১) ২১ ডিসেম্বর ১৯২১ শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে তাঁর আবির্ভাবস্থলে মাতৃমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমায়ের 'দ্বারী তথা ভারি', রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। আর ১৯ এপ্রিল ১৯২৩, বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে সারদানন্দজী স্বয়ং মাতৃমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সেখানে স্থাপন করা হয় মায়ের এক প্রমাণ মাপের তৈলচিত্র। বিলাতের এক সাহেব শিল্পীকে দিয়ে এই জীবন্ত ছবিটি আঁকিয়ে নিয়ে আসেন মায়ের ভক্ত সন্তান ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীমা ছবিটি ফুলচন্দন দিয়ে স্বয়ং পুজো করেছিলেন। তাই এই ছবিটিকেই মন্দিরবিগ্রহের মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তী একত্রিশ বছর জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে ওই চিত্রপটে শ্রীমায়ের নিত্যপূজা হয়।

কার নিত্যপূজা? গ্রামের যে-কন্যাসন্তানটি তাঁর ছেষট্টি বছর সাত মাস জীবদ্দশার মধ্যে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর নয় মাস সময়কাল এই

চিকিৎসক, গবেষক ও স্বনামধন্য সাহিত্যিক

জয়রামবাটি (পূর্বের তেঁতুলমুড়ি) গ্রামেই কাটিয়েছেন (পৃঃ ১৮৫), তাঁর এমন মন্দিরের দেবী হয়ে ওঠা গ্রামবাসীরা কীভাবে নিলেন? স্বামী নির্লেপানন্দ সুন্দর করে বিষয়টি ধরিয়ে দিয়েছেন : ''এ দেবীকে লইয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একদিন কত খেলাই না খেলিয়াছে—তাঁহার সহিত ঝগড়া-অভিমান করিয়াছে, আবার তাঁহারই আদর-যত্ন-স্নেহ, আশ্রয়-অভয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ইহারা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে আপনার জন হিসাবে পাইয়াছিলেন। কেহ 'মা', কেহ 'পিসিমা', কেহ 'দিদি', কেহ 'মাসিমা', কেহ 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতেন।" (পৃঃ ১১০)

গয়লাপাড়ার বউ আহ্লাদিনী ঘোষের অনুভব বড় আন্তরিক : ''মা-গো, তোমরা তাকে দেবী বলো, কিন্তু আমরা বুঝিনি, আমরা জানি আমাদের ঠাকুরঝি। আমাদের গাঁয়ের ঝিউড়ি সারু [সারদার অপভ্রংশ]। বাসন মাজত, ঢেঁকিতে পাড় দিত, কাপড় কাচত, মুনিষদের খেতে দিত। ঠিক আমাদের মত। তখন কি বুঝেছি গো!... এখন মনে করি, মহামায়া মায়ায় আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছিল। তাই ভাবি, বেঁচে থাকতে আমাদের ভাতকাপড় দিয়েছিল, মরলে কি পায়ে জায়গা দিবেনি?" (পৃঃ ১৯২)

শুধু ভাতকাপড় বা স্নেহ আশ্রয় নয়, তখন অনেকেই বুঝতে পারেননি, বেঁচে থাকতে থাকতেই শ্রীমা তাঁর জন্ম-কর্ম-লীলার ভূমি জয়রামবাটিতে দেবীতীর্থ প্রতিষ্ঠার কাজও অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী চেতনানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন : ''শ্রীমা ছিলেন সর্বজ্ঞ, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ও দূরদর্শী। তিনি জীবদ্দশায় কামারপুকুর ও জয়রামবাটি কেন্দ্র দুটি রামকৃষ্ণ মিশনের under-এ (অধীনে) অন্তর্ভুক্ত করবার সব ব্যবস্থা করে গেছেন। মা smoothly (স্বচ্ছন্দে) ও tactfully (কৌশলে দক্ষতার সহিত) নিজের ভাইদের কাছ থেকে ও ঠাকুরের ভাইপোদের কাছ থেকে উভয়ের জন্মস্থান রামকৃষ্ণ মিশনের আওতায় আনেন। নতুবা ভবিষ্যতে মিশনের সাধুদের এবং ঠাকুরের ও মায়ের পরিবারবর্গের মধ্যে মনোমালিন্য, মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল।" (পৃঃ ১৮)

সম্ভাবনা বা আশঙ্কা যে বিলক্ষণ ছিল সেকথা স্পষ্ট হয় মাতৃমন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ)-এর 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' গ্রন্থের স্মৃতিচারণে : ''প্রত্যেক মামাই [অর্থাৎ, শ্রীমায়ের তিন জীবিত ভাই কালী, বরদা ও প্রসন্ন] বলিয়া আসিতেছিলেন যে, অপরে জায়গা দিলে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। অথচ মনে মনে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, সকলেরই যখন অসুবিধা, তখন শেষ পর্যন্ত কেহই জায়গা দিবে না। কিন্তু দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত কে যেন তাঁহাদের ভিতর হইতে সাময়িকভাবে প্রেরণা দিয়া জায়গা বিক্রয় করাইয়া লইল।" (পৃঃ ২৬)

সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই বই। প্রচ্ছদ দেখে ধারণা হয়, বইটি এককভাবে চেতনানন্দজীর লেখা। আখ্যাপত্রে লেখা 'লেখক ও সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ'। সূচিপত্র দেখলে অবশ্য ভ্রমের নিরসন হয়—এটি একটি প্রবন্ধ সংকলন। মহারাজ তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন : ''স্বামী সারদানন্দ প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দিরের শতবর্ষের ইতিহাস যাতে বিস্মৃতির গর্ভে লীন না হয়ে যায়, তার জন্য এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমি এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ লেখক নই। আমি মাত্র দুটি অধ্যায় লিখেছি এবং বাকি অধ্যায়গুলি আমি প্রাচীন পত্রিকা এবং কয়েকজন লেখকের প্রবন্ধ থেকে সংযোজনা করেছি।" (পৃঃ ৩)

তাঁর লেখা 'জয়রামবাটি—একটি দেবীতীর্থ' এই গ্রন্থের প্রবেশক প্রবন্ধ। এখানে চেতনানন্দজী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন : ''জয়রামবাটি একাধারে

শক্তিপীঠ ও শিবপুরী। শক্তিপীঠের বিভিন্ন অর্থ আছে। যেখানে শক্তিসাধনা হয় তাকে শক্তিপীঠ বলে। আবার যেখানে দেবীর আবির্ভাব হয় বা কোন সাধক সিদ্ধিলাভ করেন তাকেও শক্তিপীঠ বলে।... জয়রামবাটিকে শ্রীমা [মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী' গ্রন্থে সংকলিত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ অনুসারে] 'শিবপুরী' নামে উল্লেখ করেছেন।" (পৃঃ ১১)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'মাতৃমন্দিরের আদিকথা'-য় (পৃঃ ১৫-৩৩) বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত নানা প্রামাণ্য তথ্যের সুনিপুণ গ্রন্থনা করেছেন চেতনানন্দজী। বিশেষত দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' (পৃঃ ১৭, ২০-২৩) এবং স্বামী পরমেশ্বরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' গ্রন্থটি থেকে (পৃঃ ২৪-৩৩)।

মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি বোঝার জন্য তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি খুব উপযোগী। 'শ্রীশ্রীমা সারদার জীবন রূপরেখা' প্রবন্ধে শ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। আর পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে তাঁর 'শ্রীশ্রীমা ও সমকালের জয়রামবাটি' প্রবন্ধ। পাঠাগারে আটকে না থেকে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের চর্চায় সরাসরি ক্ষেত্রসমীক্ষার যে-প্রামাণ্য, কষ্টকর পথটি তিনি কয়েক দশক ধরে অক্লান্তভাবে ধরে রেখেছেন তারই এক উজ্জ্বল ফসল আলোচ্য সংকলনের এই প্রবন্ধটি। শুধু নামের সাদৃশ্যের জন্য নয়, বিষয়গত গভীরতার কারণে এই প্রবন্ধ পড়লে পাঠকের মনে পড়বেই তড়িৎবাবুর সুবৃহৎ গবেষণাগ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমকালের কামারপুকুর' (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার)-এর কথা। আশা করি, জয়রামবাটি সংক্রান্ত এই প্রবন্ধটিকে এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপ দিতে লেখক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর অন্বেষণের অনুপুঙ্খতা বোঝাতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি : ''জয়রামবাটি মৌজায় জনবসতি অঞ্চল মোট পরিসর সাপেক্ষে কম হলেও সেখানে এগারোটি পাড়ার অস্তিত্ব ছিল উনিশ শতকে। পরিবার সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলেও অনেক পাড়ায় জনবসতি ছিল নিবিড়।... পাড়াগুলি মূলত পদবী ভিত্তিক। অনেক ক্ষেত্রে জাতিভিত্তিক নামকরণও ছিল। সি এস পড়চা নথি ধরে পাড়ার পরিবার সংখ্যা, পরিজন সংখ্যা এবং পুরুষ ও নারীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। (পৃঃ ১৯০)

মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে জয়রামবাটিতে যে-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণমূলক দুটি নিবন্ধ এখানে সংকলিত : স্বামী নির্লেপানন্দের 'নব্যবঙ্গে শক্তিপীঠ স্থাপনা' অনেকটাই বিস্তৃত (পৃঃ ৮১-১৪২), প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার 'মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার স্মৃতি' তুলনায় অনেকটাই সংহত (পৃঃ ১৪৩-১৪৮)। দুটি রচনাই খুব জীবন্ত। তাছাড়া দুজনেই জয়রামবাটি যাওয়ার সানন্দ যাত্রাপথের কথাও লিখেছেন। এক্ষেত্রে কিছু পুনরুক্তি এসেই গেছে। কারণ স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কলকাতা থেকে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ভক্তেরা মিলে যে-প্রায় পঞ্চাশ জনের (পৃঃ ১৪৫; নির্লেপানন্দজীর স্মৃতিতে '৩৮ খানি টিকিট ছিল আমাদের'—পৃঃ ৮৫) দল এক বড় রেল কম্পার্টমেন্টের প্রায় পুরোটা ভরে যাত্রা করেছিলেন, এই দুজন সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা ট্রেনে কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর গেছেন, সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সুরেশ্বর সেনের বাড়ি, রাতে বাইশ-চব্বিশ খানা গরুর গাড়ি (পৃঃ ৯৫, ১৪৫) করে কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, সেখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে জয়রামবাটি।

বিষ্ণুপুরের সেনবাটিতে রাত্রিবাস করে সারদানন্দজীর রওনা হওয়ার কথা ছিল পরদিন ভোরবেলা একখানি ফোর্ডমার্কা 'হাওয়াগাড়ি'-তে (পৃঃ ৯৫)। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বাঁকুড়ার সাধুদের আনানো সে-মোটরগাড়ি আর স্টার্টই

নেয়নি। ফলে মহারাজ শেষ পর্যন্ত গরুর গাড়িতেই রওনা হন। পরদিন ভোরবেলা কোয়ালপাড়া পৌঁছলে সকলে মজা করতে লাগলেন : ''আপনার মোটর গাড়ি কোথায় গেল, আপনার তো মোটর চড়ে আসবার কথা ছিল!'' মহারাজও সেই নির্মল কৌতুকে যোগ দিলেন : ''মা এ পথে কোনদিন মোটরে চড়েননি আর তাঁর দারোয়ান কিনা মোটরে চড়ে আসবে! তাই তো মা মোটর খারাপ করে দিলেন।'' (পৃঃ ১৪৭)

যাত্রাপথের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রাণপুরুষ কেশবানন্দজীর সান্নিধ্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি : ''[কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটির উদ্দেশে] বিদায় লইবার পূর্বে স্বামী কেশবানন্দজীর দাওয়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল।... জীবন দিয়া নিঃশব্দে একাগ্রমনে গ্রামে কাজ করিয়া যে অমূল্য অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বলিলেন। সেগুলি পুঁথির ছেঁদো কথা নহে, মানুষ হাতে-নাতে ঠেকিয়া-ঠকিয়া যাহা শিক্ষা করে—তাহারই কথঞ্চিৎ। লোকলোচনের অন্তরালে—যেখানে করতালি নামযশ প্রশংসা অভিবাদন নাই—সেই পল্লীগ্রামে কাজ করা যে কিরূপ কষ্টকর বেশ বুঝা গেল।'' (পৃঃ ১০৩)

অবশেষে জয়রামবাটীতে পদার্পণ। কত বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তেরা এসেছেন মাতৃমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। কেমন সে পবিত্র আয়োজন? স্বামী নির্লেপানন্দের ভাবগম্ভীর বর্ণনা : ''মনে হইল সংসার হইতে অতি দূরে ইন্দ্রের এই অমরা—এখানে শান্তসৌম্য মূর্তি গৈরিকবস্ত্রাবৃত যুবা যোগিগণ সুর-সাধনায় আপনাদের ধ্যেয় ইচ্ছাবস্তুলাভে তন্ময়—বিভোর।... ভিতর হইতে ভাবের স্রোত আসিয়া অনুক্ষণ সকল শ্রোতার প্রাণমন স্পর্শ-পুলকিত করিতে লাগিল। অন্তরে অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা চলিতে লাগিল।'' (পৃঃ ১২১) কেমন ছিল সমাগত ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা? ''এদিকে অজস্র তরিতরকারী কুটা চলিতে লাগিল। পাকশালে পঁচিশজন সূপকার কোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত, তাহাদের যোগান দিবার জন্য বহু কর্মী নিযুক্ত। রন্ধনশালা সংলগ্ন বহুজনসমাকীর্ণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহসা কিয়ৎকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল। সেই আহ্বান সকল কর্ণের জন্য। কে কোথায় আছ এস—মা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডার আজ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত—কে অভুক্ত, কে ক্ষুধিত—এস—মাতৃপ্রসাদ গ্রহণে ধন্য হও, জীবন সার্থক কর।'' (পৃঃ ১২৭)

এত বিপুল আয়োজন আর উদ্দীপনার মাঝে কিছু আফশোসের দীর্ঘশ্বাস থাকবেই। ভারতীপ্রাণা মাতাজীর যেমন মনে পড়ছে ভক্তপ্রবর ললিতমোহনের কথা, যাঁর বিলেত থেকে করিয়ে আনা শ্রীমার তৈলচিত্রটি সেদিন মাতৃমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল : ''শ্রীমা একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার জন্মস্থানটিতে একটু কিছু করো।' ললিতবাবুর সে কথা মনে ছিল। শ্রীমার দেহ যাবার পর তিনি নানা উপায়ে চ্যারিটি শো ইত্যাদি করে টাকা তোলবার সঙ্কল্প করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে কিছু করে উঠতে পারেননি।... শ্রীমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলেন না বলে মৃত্যুশয্যায় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'টাকা সব ছড়িয়ে রেখেছিলাম, কুড়োনো আর হল না।' তাঁর 'উইল'-এ তিনি যাবতীয় টাকা-পয়সা এমনকী বাড়ির ঝাঁটাটি পর্যন্ত যেন জয়রামবাটীতে শ্রীমার সেবায় লাগে, এ কথা লিখে গিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রীর জন্য অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে যান। তাঁর দেওয়া শ্রীমার তৈলচিত্রখানি তাই শরৎ মহারাজ [সারদানন্দজী] মন্দিরে রেখেছিলেন।''(পৃঃ ১৪৮)

সেই ছবি টানা একত্রিশ বছর নিত্যপূজা হওয়ার পর শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সেটির স্থানে শ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি

প্রতিষ্ঠা করেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী। এই উৎসবেরও দুই প্রত্যক্ষদর্শীর মূল্যবান স্মৃতিচারণ এখানে সংকলিত : ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য লিখিত 'জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও শতবর্ষ জয়ন্তী' এবং শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'জয়রামবাটিতে তিন দিন' [৭-৯ এপ্রিল ১৯৫৪ জুড়ে চলেছিল সেই উৎসব]। আশ্চর্য সমাপতন, মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শী নিবন্ধকার এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠার এই দুই প্রত্যক্ষদর্শী নিবন্ধকার একই পথে কলকাতা থেকে জয়রামবাটি পৌঁছেছিলেন—যদিও এই দুই উৎসবের সময়েই মাতৃধাম পৌঁছনোর আরও কিছু বিকল্প পথ ছিল। অর্থাৎ এই চারজনই কলকাতা থেকে রেলযোগে বিষ্ণুপুর এসে সেখান থেকে জয়রামবাটি যান। শুধু মধ্যের তিন দশক এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রশাসন এই পথকে অনেকটাই সুগম করেছিল।

১৯৫৪ সাল। ''২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) মঙ্গলবার রাত্রে হাওড়া হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেন এবং অতিরিক্ত বগিসংযুক্ত নিয়মিত নৈশগাড়িটিও তীর্থযাত্রিগণকে লইয়া জয়ধ্বনির আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে যাত্রা শুরু করে বিষ্ণুপুর অভিমুখে।

''ঠিক সময়েই ট্রেন দুটি ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল) ভোরের দিকে বিষ্ণুপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিরাট যাত্রীদল গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেই কয়েকজন সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে বিষ্ণুপুরের স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া কুলিদের সাহায্যে অতিশয় তৎপরতার সহিত সকলের জিনিসপত্র, বিছানা প্রভৃতি ট্রেন হইতে নামাইয়া অদূরে সারিবদ্ধ বাসগুলিতে পরপর যাত্রীদের উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে ক্ষুদ্র স্টেশনে এইরূপ অপ্রত্যাশিত সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন।" (পৃঃ ১৫৪) সবচেয়ে বড় কথা, ''জেলাশাসক আয়েঙ্গার নিজে স্টেশনে উপস্থিত থেকে সমস্ত পরিদর্শন করছিলেন।" (পৃঃ ১৬১) বিষ্ণুপুর থেকে বাসে কোতলপুর আসার প্রায় কুড়ি মাইল রাস্তা ততদিনে যথেষ্ট ভাল, সেখান থেকে নতুন তৈরি রাস্তা ধরে আট মাইল এগোলেই জয়রামবাটি, আমোদর নদের পুল পেরিয়ে একেবারে উৎসবক্ষেত্রের মূল তোরণদ্বারে।

৮ এপ্রিল ১৯৫৪ ছিল অশোকষষ্ঠী তিথি। সেদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে একশো একটি তোপধ্বনি করা হল। তোরণদ্বারে বেজে উঠল সানাইয়ের সুমধুর রাগিণী। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করানন্দজী বিশিষ্ট সাধুদের সঙ্গে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহ মাতৃমন্দির থেকে শ্রীমার বাসকক্ষ ও তাঁর পিত্রালয় পর্যন্ত গিয়ে আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। তারপর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হল। সেদিন রাত্রি নয়টা পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন। (পৃঃ ১৫৮) ''দলে দলে পল্লী-অঞ্চলের সকল গ্রাম্যপথ দিয়ে পল্লীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পিপীলিকা শ্রেণীর মতো সারি দিয়ে, প্রশস্ত রাজপথে সুদূর বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ ও অন্যান্য স্থান থেকে দলে দলে বাসে, গো-শকটে তীর্থযাত্রীর ন্যায় মন্দিরাভিমুখে আসতে লাগল।... প্রাতে শ্রীশ্রীমার ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পটমূর্তি নিয়ে যে বিরাট সঙ্কীর্তনের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল তাতেই বোঝা গেল যে, এ-দিনটি পল্লীতে এনেছে কি বিরাট প্রাণের স্পন্দন!" (পৃঃ ১৬৪-৬৫)

উৎসবের দিনের এই সুব্যবস্থাপনা কিন্তু সব সময়ের জন্য বজায় রাখা তখন সম্ভব ছিল না। ফলে জয়রামবাটি যাওয়ার পথক্লেশ সাধারণভাবে বহুকাল অবধিই অপরিবর্তিত ছিল। যেমন সম্পাদক মহারাজ বইয়ের ভূমিকায় তাঁর পথযাত্রার যে-বর্ণনা করেছেন তা শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনেরও পরের দশকের : ''১৯৬১ সালে আমি প্রথম অদ্বৈত আশ্রম থেকে কামারপুকুর-জয়রামবাটি যাই

দুর্গাপূজার সময়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে তারকেশ্বর, সেখান থেকে বাসে চাঁপাডাঙ্গা। তারপর নৌকায় দামোদর পার হয়ে বাসে হরিণখোলা। সেখানে মুণ্ডেশ্বরীতে খেয়া নৌকায় উঠতে গিয়ে এক পা কাদায় সেঁধে গেল। পা তুলতে পারলুম, কিন্তু চটিটা রয়ে গেল। নৌকায় বসে পা ধুলুম এবং অন্য চটিটা নদীতে ফেলে দিলুম। নিজেকে সান্ত্বনা দিলুম—ঠাকুর-মায়ের ইচ্ছা নয় যে আমি চটি পরে তাঁদের পুণ্য জন্মস্থানে ভ্রমণ করি।" (পৃঃ ২) প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে স্বামী সারদেশানন্দের স্মৃতিচারণ : ''পথশ্রমে পরিশ্রান্তা যোগেন-মা জয়রামবাটিতে শরৎ মহারাজকে বলেন, 'বাপু, এখানে আসা লোকের পক্ষে গয়া কাশী যাওয়া অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার।' মহারাজও তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'এ কি গয়া কাশীর চেয়ে ছোট তীর্থ!' " (পৃঃ ১০)

ভক্তমনে দেবীতীর্থ হিসাবে জয়রামবাটির এই উত্তরণের রূপরেখা ধরিয়ে দিয়েছেন দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী ঋতানন্দ তাঁদের দুই প্রবন্ধে—যথাক্রমে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে মাতৃধাম জয়রামবাটি' এবং 'জয়রামবাটি শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের ক্রমবিকাশ'। ঋতানন্দজীর আরও একটি অনুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ এখানে সংকলিত—'ধন্য বাঁকুড়া জেলা'। কয়েকটি আফশোসের কথা বলি। মাতৃমন্দিরের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সুমুদ্রিত এই সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে উৎসবের এক বছর পর অক্ষয়তৃতীয়া ২০২৪-এ, সেই আয়োজনের কোনও বিবরণী এখানে স্থান পেলে ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক তথ্যটুকুও এখানে নথিবদ্ধ থাকত। আর একটি কথা, বহু দুর্লভ চিত্র শোভিত এই মহার্ঘ্য স্মারক; জয়রামবাটি গ্রাম ও মাতৃমন্দিরের বহু প্রাচীন ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে এখানে সযত্নে পুনর্মুদ্রিত; আছে কিছু মানচিত্রও। এগুলির যথাযথ এক চিত্রসূচি নির্মাণ করলে ভাল হত। ভাল হত, তন্নিষ্ঠ পাঠকের কথা ভেবে বইটির শেষে এক বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিলেও।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী একবার প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীকে বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণযুগ' শেষ হয়েছে এবং 'সারদাযুগ' শুরু হয়েছে। (পৃঃ ২১৭) সত্যি তাই, পৃথিবীজোড়া ভক্ত-সন্তানরা মায়ের কাছেই অনেক সহজে প্রাণের আরাম পান। সেই নবযুগের যিনি ধাত্রী তাঁর জন্মভূমি, কর্মভূমি, লীলাভূমি এই জয়রামবাটি। মাতৃমন্দির তাই বহু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। শ্রীমা সেই দেবীতীর্থ সম্পর্কে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন : ''এখানে অত সব (জপধ্যান) করতে হবে না। এখানে এসে খাবে দাবে, আর আনন্দ করবে"; বলেছেন, ''এখানে তিনরাত্রি বাস কল্লে দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, এটা শিবের পুরী কিনা!" (পৃঃ ২৩৫)

তারপর আমোদর, দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বরের ওপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক পলি পড়েছে তাদের বুকে, পাড়ে অনেক ভাঙা-গড়া হয়েছে। কিন্তু মায়ের সেই আশ্বাসবাণীর প্রতি ভক্তের ভরসা যেন আরও নিখাদ, সুনিশ্চিত হচ্ছে। শ্রীমায়ের প্রয়াণ পরবর্তী আবেগ জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরকে কেন্দ্র করে আরও বেগবতী হয়েছে—এত প্রজন্ম পেরিয়ে আসার পরেও। তার ক্ষয় নেই, তার ক্ষয় নেই।

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

১৪ মার্চ ২০২৫ দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।